সূরা আল-হিজর:১ম রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(১-১৫)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الٓرٰ ۟ تِلۡکَ اٰیٰتُ الۡکِتٰبِ وَ قُرۡاٰنٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۱ ১ : ১৫

১. আলিফ-লাম-রা, এগুলো হচ্ছে আয়াত মহাগ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কুরআনের।

এটি এ সূরার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক ভূমিকা। এরপর সাথে সাথেই আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। আয়াতের তাফসীর সূরা সমূহের শুরুতে হুরূফে মুকাত্তাআ' ত এসেছে. হুরুফে মুকাত্তাআ' ত (حروف مقطعات) হলো পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বা রহস্যময় কিছু একক অক্ষর বা বর্ণ। যেমন—'আলিফ-লাম-মীম' (الم), 'ত্বা-হা' (طه), বা 'ইয়া-সীন' (يس)। কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে মোট ২৯টি সূরার শুরুতে এই বর্ণগুলো রয়েছে।

ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরদের মতে, হুরুফে মুকাত্তাআ' তের প্রকৃত ও নির্দিষ্ট অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানেন না। এগুলোকে 'মুতাশাবিহাত' বা রহস্যময় ও আলংকারিক হিসেবে গণ্য করা হয়.

তবে অনেক মুফাসসির বলেছেন, এগুলো কুরআনের معجزة (অলৌকিকতা) প্রমাণ করে।

---আরবি 'কুরআন' (القرآن) শব্দের শাব্দিক বাংলা অর্থ হলো 'যা বারবার পড়া হয়', 'পঠিত' বা 'যা একত্র করা হয়েছে'।

-- মুবিন (مُبِين) শব্দের অর্থ প্রকাশ্য, স্পষ্ট বা যা নিজেই পরিষ্কার এবং অন্যকেও পরিষ্কার করে দেয়। " সুস্পষ্ট" শব্দটি কুরআনের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এগুলো এমন এক কুরআনের আয়াত যে নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।

কুরআনের মূল পরিচয় হ' ল এই যে, এটি 'কালামুল্লাহ' (كَلَامُ اللهِ) বা আল্লাহর কালাম। যা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। ছহীহ ইবনু হিববান হা/৭৭৪;

"তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত"। নিসা ৪/৮২;

(আরো উদাহরন আন 'আম ৬/১১৫; আ 'রাফ ৭/৩৫; হামীম সাজদাহ ৪১/৪২; ওয়াকি 'আহ ৫৬/৭৭-৮২; হাক্কাহ ৬৯/৪৩; দাহর ৭৬/২৩।

সৃষ্টিজগত দুনিয়াবী চোখে কখনোই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না (আন 'আম ৬/১০৩)। তবে তাঁর 'কালাম' দেখে, পড়ে, শুনে ও বুঝে হেদায়াত লাভ করতে পারবে। কুরআনের ভাব ও ভাষা, এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর। জিব্রীল ছিলেন বাহক। বাক্বারাহ ২/৯৭; শু 'আরা ২৬/১৯৪; তাকভীর ৮১/১৯।

এবং রাসূল (ছাঃ) ছিলেন এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা। মায়েদাহ ৫/৬৭; নাহল ১৬/৪৪, ৬৪।

কুরআন লওহে মাহফূযে (সুরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ ছিল' (বুরূজ ৮৫/২১-২২)। সেখান থেকে আল্লাহর হুকুমে ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে। আলে ইমরান ৩/৩; ইসরা ১৭/১০৬; ফুরক্বান ২৫/৩২; যুমার ৩৯/২৩।

মহাগ্রন্থ এবং সুস্পষ্ট কুরআন থেকে নবী (সাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে, যেমন

"قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ..

অনুবাদ: "...অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।" সূরা আল-মায়েদা (৫:১৫)

سورة المائدة (১৫) قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

এ নূর (আলো) এবং কিতাব উভয় থেকে কুরআন কারীমকেই বুঝানো হয়েছে। কুরআনের মর্যাদা বর্ধনের উদ্দেশ্যে কুরআনকে নাকেরা (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই কুরআন সম্পূর্ণ এবং অত্যন্ত মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ।

"الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ"

"আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।" সূরা ইউসুফ (১২:১

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٢﴾ ১৫ : ২

২. কখনো কখনো ওরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!

কখন কাফেরগণ সেটা আকাংখা করবে? কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা এটা মৃত্যুর সময় কামনা করবে। [ইবন কাসীর] তবে এ ব্যাপারে একটি হাদীসের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, সেটা আখেরাতে তারা কামনা করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "জাহান্নামবাসীরা যখন জাহান্নামে একত্রিত হবে, তারা তাদের সাথে কিছু গুনাহগার মুমিনদেরকেও দেখতে পাবে, তখন তারা বলবেঃ তোমাদের ইসলাম তোমাদের কোন কাজে আসলো না, তোমরা তো দেখছি আমাদের সাথে জাহান্নামেই রয়ে গেলে। তারা বলবেঃ আমাদের কিছু গুনাহ ছিল যার কারণে আমাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা যা বলেছে আল্লাহ তা শুনলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তখন কিবলার অনুসারী মুসলিমগণকে বের করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর তখন কাফেরগণ আফসোস করে বলবেঃ হায়! আমরা যদি মুসলিম হতাম তাহলে তারা যেভাবে বের হয়ে গেছে সেভাবে আমরাও বের হতে পারতাম। সাহাবী আবু মূসা আল-আশ'আরী বলেনঃ আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেনঃ "আলিফ-লাম-রা, এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের কখনো কখনো কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত।" [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৪২]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মুসলমানদের প্রতি মুশরিকদের এই ভৎসনা শুনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেনঃ ‘যার অন্তরে অনুপরিমাণও ঈমান রয়েছে তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে নাও। ঐ সময় কাফিররা কামনা করবে যে, যদি তারাও মুসলমান হতো!হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত।

এভাবে কাফেররা যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে তখন লজ্জিত হবে এবং আফসোস করে ঈমান আনার জন্য আকাংখা করতে থাকবে। কিন্তু তাদের সে আকাংখা কোন কাজে লাগবে না।

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যারা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে তাদের মধ্যে কতক লোক পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে। তখন লাত ও উয্যার পূজারীরা তাদেরকে বলবেঃ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলায় তোমাদের কি উপকার হলো? তোমরা তো আমাদের সাথেই জাহান্নামে পুড়ছো?” তাদের এ কথা শুনে আল্লাহ তাআলার করুণা উথলিয়ে উঠবে। তিনি তাদের সকলকেই সেখান থেকে বের করিয়ে আনবেন এবং জীবন নহরে তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন। তখন তাদেরকে এমনই দেখা যাবে যেমন চন্দ্রকে ওর গ্রহণের পরে দেখা যায়। অতঃপর তারা সবাই জান্নাতে যাবে।” এ হাদীসটি শুনে কেউ একজন হযরত আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কি এটা রাসুলুল্লাহর (সঃ) মুখ থেকে শুনেছেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “জেনে রেখো যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আমি বলি নাই, অথচ আমার উদ্ধৃতি দেয়), সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান বানিয়ে নেয়।” এতদসত্ত্বেও আমি বলছি যে, আমি এ হাদীস স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুখ থেকে শুনেছি।” (এ হাদীসটি হাফিজ আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ “আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে আবার ফেরত পাঠানো হত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। [সূরা আল-আনআমঃ ২৭]

“যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! এটাকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ। তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে; দেখুন, তারা যা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট। [সূরা আল-আনআমঃ ৩১]

“যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু’হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। [সূরা আল-ফুরকানঃ ২৭]

মানুষ সময় থাকতে সময়ের মুল্য দেয় নাই।

ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُوۡا وَ يَتَمَتَّعُوۡا وَ يُلۡهِهِمُ الۡاَمَلُ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳ ১৫ : ৩

৩. তাদেরকে ছাড়ুন, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অতঃপর অচিরেই তারা জানতে পারবে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-বাসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা আখেরাত ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না।

মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। এখানে দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও আনুগত্য ত্যাগ করে, দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন হওয়া, তাওবাহ ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন পরিত্যাগ করা এবং মৃত্যু ও আখেরাত থেকে নিশ্চিন্ত দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]
আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে দামেশ্বকবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্খী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দুদিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে? [ইবনুল মুবারক আয-যুহদ ৮৪৭; কুরতুবী] হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্খার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়। [কুরতুবী]

() অর্থাৎ মানুষের আশা-আকাংখা, লোভ-লালসা এতবেশী যে, সে তার পিছনে এতই মগ্ন থাকে যে, তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ তার আশা পুরোয় না। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কোন বিশিষ্ট একটি ঘর আঁকলেন। তারপর তার মধ্যভাগ থেকে একটি রেখা একে তা বৃত্তের বাইরে নিয়ে গেলেন। তারপর এ রেখার বাইরের অংশে ছোট ছোট কতগুলো রেখা আড়াআড়ি ভাবে মাঝ বরাবর আঁকলেন এবং বললেনঃ “এটা (মধ্যবিন্দু) হলো মানুষ, আর এর চারপাশে যে রেখা তাকে ঘিরে আছে দেখা যাচ্ছে সেটা তার আয়ু। আর যে রেখা বাইরের দিকে চলে গেছে সেটা তার আশা-আকাংখা। আর এই যে, ছোট ছোট রেখাগুলো আছে সেগুলো তার বিপদাপদ বালা-মুসিবত যদি কোন একটি থেকে বেঁচে যায় অপরটি তাকে জাপটে ধরে। তারপর এটা থেকে বেঁচে গেলেও অপরটি তাকে ঠিকই ধরে ফেলে। [বুখারীঃ ৬৪১৭]

() অচিরেই তারা জানতে পারবে তাদের ও তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম কি হবে। [ইবন কাসীর]

অন্য আয়াতে সে পরিণামটি বলা হয়েছে, “বলুন, ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের ফিরে যাওয়ার স্থান [সূরা ইবরাহীম: ৩০]

আরও এসেছে, “তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী, সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য [সূরা আল-মুরসালাত: ৪৬-৪৭]

দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবনে মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা তামাম মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। যাতে মানুষ তার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলার দাসত্ব করে।

ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম আনন্দ-বিনোদন, প্রবৃত্তির দুর্বলতা, আকর্ষণ সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর সে সব মানুষের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। পাশাপাশি জীবন পরিচালনার জন্য নাজিল করেছেন পবিত্র কুরআনুল কারিম। জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে পরিচালিত করতে হবে দুনিয়ার এ ক্ষনস্থায়ী জীবন।

যারা কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে বা করছে, তারা পরকালেই নয় বরং দুনিয়াতেও সফল। তবে মানুষের ক্ষনস্থায়ী এ জীবনে সবচেয়ে বেশি আসক্তি বা বেশি চাহিদা কোন জিনিসের প্রতি সে কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। যারা কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ সব জিনিসের ব্যবহার বা ভোগ করবে, তারাই সফলকাম। আল্লাহ তাআলা বলেন- "নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল"। আলে ইমরান;১৪

''আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি মানুষকে পরীক্ষার জন্য---।'' (সূরা কাহ্ফ ৭ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে যা আল্লাহর যিকর বা স্মরণে করা হয় ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং দ্বীনী জ্ঞানে আলেম ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারী। [তিরমিযী: ২৩২২; ইবন মাজাহ: ৪১১২]

وَ مَاۤ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡیَۃٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُوۡمٌ ﴿۴﴾ ১৫ : ৪

৪. আর আমরা যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল

مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّۃٍ اَجَلَهَا وَ مَا یَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ﴿۵﴾ ১৫ : ৫

৫. কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না

মুহাম্মদ সা দীর্ঘ ১৩বছর মক্কায় দাওয়াতের কাজ করেছেন, এর মাঝে কাফেরদের পূরু ধবংস করেন নি। কাফেররা মনে করছিলো এই দাওয়াত গ্রহন নয়া করেও আমাদের কিছু হয় নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তিনি কোন জনপদকে ঐ সময় পর্যন্ত ধ্বংস করেননি যতক্ষণ তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেননি। শুধু প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করাই নয় বরং তাদের জন্য একটি সময় অবশ্যই আছে সে সময়ও আসতে হয়েছে। তাদের সে সময়ের আগেও তাদের ধ্বংস করা হবে না, তাদের সে সময়ের পরেও তাদের ধ্বংস বিলম্বিত হবে না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ কুফরী করার সাথে সাথেই আমি কখনো কোন জাতিকে পাকড়াও করিনি। তাদেরকে শুনবার, বুঝবার ও নিজেকে শুধরে নেবার জন্য অবকাশ দেয়া হবে। যতক্ষন এ অবকাশ থাকে এবং আমার নির্ধারিত শেষ সীমা না আসে ততক্ষন আমি ঢিল দিতে থাকি। এর মাধ্যমে মূলত: মক্কাবাসী কাফেরদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে তাদের শির্ক, ইলহাদ ও গোয়ার্তুমী থেকে ফেরৎ আসারই

আহবান জানানো হচ্ছে, যে শির্ক, ইলহাদ ও গোয়ার্তুমীর কারণে তারা ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ তাফসীরের পক্ষে আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: "আর আমি যতক্ষণ কোন রাসূল প্রেরণ না করব ততক্ষণ শাস্তিদাতা নই" [সূরা আল-ইসরা ১৫;

আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন: "বলুন, 'আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত আমার নিজেরও কোনো ক্ষতি বা লাভ করার ক্ষমতা নেই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে। তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় চলে আসলে তারা এক মুহূর্তও আগে বা পরে হতে পারবে না। সূরা ইউনুস: ৪৯]

২০১৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার তানজুং লেসুং সমুদ্র সৈকতে একটি লাইভ কনসার্টে হঠাৎ সুনামি আছড়ে পড়ে। পপ-রক ব্যান্ড Seventeen-এর গান চলাকালীন এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্টেজ ও দর্শক ভেসে যায়। এতে ব্যান্ডটির একাধিক সদস্য ও অনেক দর্শক প্রাণ হারান।

وَ قَالُوۡا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡ نُزِّلَ عَلَیۡهِ الذِّکۡرُ اِنَّکَ لَمَجۡنُوۡنٌ ؕ﴿۶﴾ ১৫ : ৬

৬. আর তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি যিকর নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ

যিকির বা বাণী শব্দটি পারিভাষিক অর্থে কুরআন মজীদে আল্লাহর বাণীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বাণী হচ্ছে আগাগোড়া উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। পূর্ববর্তী নবীদের ওপর যতগুলো কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলো সবই "যিকির" ছিল এবং এ কুরআন মজীদও যিকির। যিকিরের আসল অর্থ হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া। যিকর (أَلذِّكْرُ) একটি আরবি শব্দ। এর সহজ অর্থ হলো স্মরণ করা, মনে করা, উল্লেখ করা বা আলোচনা করা। যদিও অন্তরে স্মরণ করাই এর প্রাথমিক অর্থ কিন্তু মুখের ভাষায় যেহেতু মনের ভাব প্রকাশ পায় তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মুখে উচ্চারণ করা ও আলোচনা করাকেও 'যিকর' বলা হয়। এমনিভাবে 'যিকর' শব্দটি 'তাযকীর' অর্থেও ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ স্মরণ করাকে যেমন 'যিকর' বলা হয় তেমনি স্মরণ করানোকেও যিকর বলা হয়। তাছাড়া 'যিকর' তথা স্মরণ করা ও স্মরণ করানোর বিভিন্ন ধরণ ও প্রকার রয়েছে। কুরআনে কারীমের বহুসংখ্যক আয়াতে কুরআনকে الذكر (আযযিকর) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এমনিভাবে একই শব্দমূল থেকে নির্গত الذكرى (আযযিকরা) এবং التذكرة (আততাযকিরাহ) উপাধিও কুরআনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের স্থান পঞ্চাশেরও অধিক। মাক্কী জীবনের একদম শুরুর দিকে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তাতেও এই নামগুলির উল্লেখ রয়েছে।

সূরা কলাম (মাক্কী)-এর ৫২ নং আয়াত- وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

আযযিকর' নামটি অর্থ-প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ও ব্যঞ্জনাময় একটি শব্দ

এক. 'যিকর' অর্থ স্মরণ।

দুই. 'যিকর' শব্দের আরেক অর্থ 'তাযকীর' তথা স্মরণ করানো এবং যা কোনো কিছুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিন. স্মারক অর্থে 'আযযিকর' নামটি কুরআন অবতারণের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

চার. যিকর, যিকরা এবং তাযকিরা- এই শব্দগুলোর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে, ওয়াজ-নসীহত। কেননা ওয়ায-নসীহত মানুষকে জাগানোর এবং করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় স্মরণ করানোর একটি মর্মস্পর্শী উপায়।

() তারা ব্যঙ্গ ও উপহাস করে একথা বলতো। [সা' দী] এ বাণী যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে একথা তারা স্বীকারই করতো না। আর একথা স্বীকার করে নেয়ার পর তারা তাকে পাগল বলতে পারতো না। আসলে তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, "ওহে, এমন ব্যক্তি! যার দাবী হচ্ছে, আমার ওপর যিকির তথা আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।" [ইবন কাসীর] এটা ঠিক তেমনি ধরনের কথা যেমন ফেরআউন মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত শুনার পর তার সভাসদদের বলেছিলঃ "নিশ্চয় যে রাসূল তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, অবশ্যই সে উন্মাদ।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ২৭]

﴿لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾ ১৫ : ৭

৭. তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?

এটি কাফেরদের কুফরী ও বিরূদ্ধাচরণের বর্ণনা। তারা নবী (সাঃ)-কে পাগল বলত। আর বলত যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি কোন ফিরিশতা পাঠান, যিনি তোমার রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করবেন অথবা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন।

তারা বলতঃ তুমি যদি মনে করে থাক যে তোমার কাছে আল্লাহর বাণী এসেছে তবে একথা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ফেরেশতাগণ এসে তা প্রমাণ করুন। নতুবা আমরা সেটা বিশ্বাস করছি না। এভাবে ফেরেশতা নাযিল করার দাবী কাফেরদের চিরাচরিত অভ্যাস। ফেরআউন বলেছিলঃ "মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফিরিশতাগণ দলবদ্ধভাবে?" [সূরা আয-যুখরুফঃ ৫৩]

আরবের কাফেররাও বলেছিলঃ "যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফিরিশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রব কে দেখি না কেন? তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২১]

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿٨﴾ ১৫ : ৮

৮. আমরা ফেরেশতাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; আর (ফেরেশতারা উপস্থিত হলে) তখন তারা আর অবকাশ পেত না।

অর্থাৎ নিছক তামাশা দেখাবার জন্য ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করানো হয় না। কোন জাতি দাবী করলো, ডাকো ফেরেশতাদেরকে আর অমনি ফেরেশতারা হাযির হয়ে গেলেন, এমনটি হয় না। কারণ ফেরেশতারা এজন্য আসেন না যে, তারা লোকদের সামনে সত্যকে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং গায়েবের পর্দা চিরে এমন সব জিনিস দেখিয়ে দেবেন যার প্রতি ঈমান আনার জন্য নবীগণ দাওয়াত দিয়েছেন। যখন কোন জাতির শেষ সময় উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করার সংকল্প করে নেয়া হয় তখনই ফেরেশতাদেরকে

পাঠানো হয়। তখন কেবলমাত্র ফায়সালা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়। তখন আর একথা বলা হয় না যে, এখন ঈমান আনলে ছেড়ে দেয়া হবে। যতক্ষণ সত্য আবরণ মুক্ত না হয়ে যায়, কেবল ততক্ষণ পর্যন্তই ঈমান আনার অবকাশ থাকে। তার আবরণ মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর ঈমান আনার কি অর্থ থাকে?

আর তারা বলে, তার কাছে কোন ফিরিশতা কেন নাযিল হয় না? আর যদি আমরা ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, তারপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হত না। সূরা আন'আমঃ ৮

কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ফিরিশতা নাযিল হয় না এমনটি অস্বীকার করত। তারা স্পষ্টই জানত যে, রাসূলের কাছে ফিরিশতাই ওহী নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের কাছে তা জানাতেন। এখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলের সাথে কেন অপর একজন ফিরিশতা সতর্ককারী হিসেবে সার্বক্ষনিক থাকে না। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘‘আরও তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশতা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?’’ [সূরা আল-ফুরকান: ৭] [আদওয়াউল বায়ান]

আরও বলেন, যেদিন তারা ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। [সূরা আল-ফুরকান: ২২] আদওয়াউল বায়ান]

মানুষের প্রতি আল্লাহর এটা বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকেই নবী ও রসূল বানিয়েছেন। আর এটাকে কুরআনেও মহান আল্লাহ অনুগ্রহ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

{لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ‘‘আল্লাহ মু’ মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল পাঠিয়েছেন।’ (সূরা আলে ইমরান ১৬৪) কিন্তু নবীদের মানুষ হওয়া কাফেরদের বিস্ময় ও বিচলিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা মনে করত যে, রসূল মানুষের মধ্য থেকে নয়, বরং ফিরিশতাদের মধ্য হতে হওয়া উচিত। অর্থাৎ, তাদের মতে, মানুষ রসূল হওয়ার উপযুক্ত নয়। যেমন, বর্তমানের বিদআতীরাও এটা মনে করে। تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ কাফের ও মুশরিকরা রসূলদের মানুষ হওয়ার কথা তো অস্বীকার করতে পারত না। বর্তমানের বিদআতীরা রিসালাতের কথা তো অস্বীকার করে না, কিন্তু মানুষ হওয়াকে রসূল হওয়ার পরিপন্থী মনে করে রসূলদের মানুষ হওয়ার কথা অস্বীকার করে। যাই হোক মহান আল্লাহ এই আয়াতে বলছেন, যদি আমি কাফেরদের দাবী অনুযায়ী কোন ফিরিশতাকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করতাম অথবা এই রসূলের সত্যায়নের জন্য কোন ফিরিশতা অবতীর্ণ করতাম (যেমন, এখানে এই কথাটাই বলা হয়েছে) অতঃপর তারা যদি তার উপর ঈমান না আনত, তবে কোন অবকাশ না দিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত।

“সত্য সহকারে অবতীর্ণ হওয়ার” মানে হচ্ছে সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ তারা মিথ্যাকে মিটিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সত্যকে কায়েম করার জন্যই আসেন। অথবা অন্য কথায় বুঝে নিন, তারা আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে আসেন এবং তা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ {৯ ৭ : ১৫

৯. নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।

অর্থাৎ এই বাণী, যার বাহক সম্পর্কে তোমরা খারাপ মন্তব্য করছ, আল্লাহ নিজেই তা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি একে কোন প্রকার বাড়তি বা কমতি, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়া থেকে হেফাযত করবেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না–সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] আরও বলেছেন,

"নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।" [সূরা আল-কিয়ামাহঃ ১৭-১৯]।

সুতরাং একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগও তোমরা কেউ কোনদিন পাবে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্বেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি।

রিসালাত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। দ্বীনি ব্যাপারাদীতে মুসলিমদের ক্রটি ও অমনোযোগিতা সত্বেও কুরআনুল কারীম মুখস্ত করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখো লাখো বরং কোটি কোটি মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকা, যাদের বক্ষ-পাজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষনাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবন ওয়াইনা এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, কুরআনুল কারীম যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছেঃ (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) [সূরা আল-মায়েদাঃ ৪৪] অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই যখন ইয়াহুদী ও নাসারাগণ হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেল। পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) অর্থাৎ "আমিই এর সংরক্ষক" [সূরা আল-হিজরঃ ৯]। সুতরাং এটি কখনও অসংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ নেই। কুরতুবী]

وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ١١ : ١٥

১১. আর তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

এখানে নবী (সাঃ)-কে সান্তনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা শুধু তোমাকেই মিথ্যাবাদী বলছে তা নয়; বরং প্রত্যেক নবীর সাথেই এরূপ আচরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক রাসূলকেই তার উম্মাতের লোক মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং সে তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হঠকারিতা ও অহংকারের কারণে আমি অপরাধ ও পাপীদের অন্তরে রাসূলদের অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খেয়াল জাগিয়ে তুলি। তাতেই তখন তারা মজা ও আনন্দ উপভোগ করে। এখানে মুজরিম বা অপরাধীদের দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা সত্যকে বিশ্বাস করতেই চায় না। আল্লাহ পাক

বলেন যে, পূর্ববর্তীদের আচরণ তাদের মধ্যে এসে গেছে। সুতরাং তাদের পরিণাম তাদের পূর্ববর্তীদের মতই হবে। যেমন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের নবীরা মুক্তি পেয়েছিলেন ও মু'মিনরা নিরাপত্তা লাভ করেছিল, তেমনই অবস্থা এদেরও হবে এটা তাদের স্মরণ রাখা উচিত। নবীর (সঃ) অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ, আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণেই রয়েছে উভয় জগতে লাঞ্ছণা ও অপমান।

كَذٰلِكَ نَسۡلُكُهٗ فِیۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ১২ : ১৫

১২. এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি

সাধারণত অনুবাদক ও তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন: আমি তাকে প্রবেশ করাই বা চালাই। এর মধ্যকার (৹) সর্বনামটিকে বিদ্রুপ এর সাথে এবং (তারা এর প্রতি ঈমান আনে না) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। তারা এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি এভাবে এ বিদ্রূপকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই এবং তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনে না।" [সা' দী] যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে কোন ত্রুটি নেই, তবুও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী উভয় সর্বনামই "যিকির" বা বাণীর সাথে সংযুক্ত হওয়াই বেশী নির্ভুল বলে মনে হয়। [ফাতহুল কাদীর]

আরবী ভাষায় (سلك) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। [কুরতুবী] কাজেই এ হিসেবে আয়াতের অর্থ, ঈমানদারদের মধ্যে তো এই "বাণী" হৃদয়ের শীতলতা ও আত্মার খাদ্য হয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু অপরাধীদের অন্তরে তা বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোড় ওফোড় করে দিয়েছে। তাদের অন্তরে এ কুরআন ঢুকলেও তা সেখানে স্থান পায় না। সেখান থেকে শুধু মিথ্যারোপই বের হয়। [দেখুন, কুরতুবী

অন্তরে তাদের আলো নেই অন্ধকারই থাকে।

لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ وَ قَدۡ خَلَتۡ سُنَّۃُ الۡاَوَّلِیۡنَ ১৩ : ১৫

১৩. এরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না, আর অবশ্যই গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের রীতি

وَ لَوۡ فَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوۡا فِیۡهِ یَعۡرُجُوۡنَ ১৪ : ১৫

১৪. আর যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই অতঃপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে,

لَقَالُوۡۤا اِنَّمَا سُکِّرَتۡ اَبۡصَارُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٌ مَّسۡحُوۡرُوۡنَ ১৫ : ১৫

১৫. তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

পূর্ববর্তীদের রীতি চলে গেছে যে, তারা ঈমান আনেনি। আর আল্লাহও তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের

উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং বর্তমানকালের কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থাও তদ্রুপ হবে, তারা ঈমান আনবে না, আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [জালালাইন, আইসারুত তাফসীর, মুয়াসসার]

তাদের কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ফিরিশতা অবতীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তারা সেই দরজা দিয়ে আকাশে যাওয়া-আসা শুরু করে, তবুও তাদের চক্ষুতে বিশ্বাস হবে না এবং রসূলগণকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবে না। বরং তারা বলবে, আমাদের চোখে বা আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে, যার কারণে আমাদেরকে এরকম মনে হচ্ছে যে, আমরা আকাশে আসা যাওয়া করছি; অথচ এমনটি নয়!

অস্বীকারের মানসিকতা: মানুষের অন্তরে সত্য গ্রহণের ইচ্ছা না থাকলে যেকোনো অসম্ভব বা দৃশ্যমান অলৌকিক নিদর্শন দেখালেও তারা তা অস্বীকার করবে।

জাদুর অপবাদ: স্বচক্ষে অলৌকিক কিছু দেখার পরও তারা একে জাদু বা চোখের পলক বাঁধা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

হঠকারিতা: কেবল প্রমাণের অভাবেই মানুষ ঈমান আনে না, বরং এর জন্য সৎ ও উন্মুক্ত অন্তরের প্রয়োজন হয়.